

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্ধশত প্রজ্ঞাপন শুধু নামেই

■ সাক্ষির নেওয়াজ

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্ধশত প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র কোনো কাজে আসছে না। এসব আদেশ-নির্দেশ মানছে না কেউই। কমবেশি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকরা এসবের ব্যত্যয় ঘটালেও দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এর মধ্যে বেশ কিছু নীতিমালা রয়েছে, যেগুলো জারির পর আর কার্যকর হয় না। ফলে এসব পুরোপুরি কাণ্ডজে নির্দেশে পরিণত হয়েছে, বাস্তবে অনুসরণ হচ্ছে না। এসব আদেশ-নির্দেশের ক্ষেত্রে 'কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই' প্রবাদবাক্যটি পুরোপুরি যথার্থ। শিক্ষাবিদরা বলছেন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা না গেলে অনেকের মধ্যেই আইন ভঙ্গের প্রবণতা গেড়ে বসবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলোচিত প্রজ্ঞাপনের মধ্যে রয়েছে— শিক্ষার্থীদের জন্য ১১ ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ করা, শিক্ষকদের কোচিং বন্ধের নীতিমালা, যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, ভর্তি নীতিমালা অনুসরণ করা (যাতে ভর্তিসহ বিভিন্ন ধরনের ফি নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে), শিক্ষার্থীদের বোরখা পরতে বাধ্য না করা, শিক্ষার্থীদের সাতার শেখানো, খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা, বাল্যবিয়ে বন্ধে শিক্ষকদের ভূমিকা রাখা, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য সংবলিত নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করা, ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট নির্মাণ ও সেখানে স্যানিটারি ন্যাপকিন রাখা, বিদ্যালয়ের গেটে ইউনিফর্মধারী প্রহরী নিয়োগ করা ইত্যাদি। সমকালের অনুসন্ধান দেখা গেছে, দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব আদেশ আদৌ প্রতিপালিত হচ্ছে না।

এ বিষয়ে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন সমকালকে বলেন, 'আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাই। এগুলো যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে কি-না তা দেখভালের দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি)। এরপরও কোথাও কোনো ব্যত্যয় মন্ত্রণালয়ের গোচরে আনা হলে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।'

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১ ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১১ সালের ৯ আগস্ট এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। এতে যে ১১ ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয় তা হলো— হাত-পা বা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত বা বেত্রাঘাত, শিক্ষার্থীর দিকে চক বা ভাস্কির জাতীয় বস্তু ছুড়ে মারা, আছাড় দেওয়া ও

চিমটি কাটা, কামড় দেওয়া, চুল টানা বা চুল কেটে দেওয়া, হাতের আঙুলের ফাকে পেনসিল চাপা দিয়ে মোচড় দেওয়া, ঘাড় ধাক্কা, কান টানা বা উঠবোস করানো, চেয়ার, টেবিল বা কোনো কিছুর নিচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাঁটু গেড়ে দাঁড় করে রাখা, রোদে দাঁড় করিয়ে বা গুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো এবং ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো, যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ। অথচ এই নিষেধাজ্ঞার পরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরহামেশা শিশু শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। বড় কোনো ঘটনা গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, নচেৎ নয়।

ইউনিসেফের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের ২ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে ছয়জনকে নিয়মিতভাবে শারীরিক শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। বেসরকারি সংস্থা ব্লাস্টের উপপরিচালক মাহবুবা আক্তার জানান, 'এখনও এই আদেশটি সেই অর্থে কার্যকর হচ্ছে না। কেউ সেভাবে অভিযোগও করছে না। অভিভাবকরা বাড়িতেও শিশুদের শারীরিক শাস্তি দিচ্ছে, এ ক্ষেত্রেই বা আইনের আশ্রয় কে নেবে?'

একইভাবে ২০১২ সালের ২০ জুন জারি করা হয় কোচিং বাগিচা বন্ধের নীতিমালা-২০১২। এই নীতিমালায় বলা হয়েছিল, সরকারি-বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার কোনো শিক্ষক তার নিজ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীকে কোচিং করতে বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। এমনকি শিক্ষকরা বাগিচাক কোচিং সেন্টারেও পড়াতে পারবেন না। অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। সরকার নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের ভেতরই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্লাস করানো যাবে। দেখা গেছে, খোদ রাজধানীর নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই এ নিয়ম মানছেন না। তারা অনায়াসে নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ব্যাচে পড়াচ্ছেন বা পড়াতে বাধ্য করছেন। ওই নীতিমালায় বলা হয়েছিল— এই নীতিমালা না মানলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জড়িত শিক্ষকের বেতনের সরকারি অংশ (এমপিও) বাতিল বা হ্রাস করা হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হবে। অন্যদিকে নীতিমালা লঙ্ঘন করলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অসদাচরণের দায়ে সরকারের শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাস্তবে আজ পর্যন্ত কোনো শিক্ষকের এই নীতিমালার আলোকে শাস্তি

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

নীতিমালা জারির পর কার্যকর হয় না

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্ধশত

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

পেতে হয়নি। গত বছরের ৮ এপ্রিল স্কুল-কলেজে সাতার শেখা বাধ্যতামূলক করে পরিপত্র জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে সাতার শেখানোর জন্য অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিপত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুকুর ও জলাশয় পরিষ্কার করে অবিলম্বে সাতার উপযোগী করা এবং পাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ছেলে ও মেয়েদের পৃথক সময়ে সাতার শেখানো এবং এ সময়ে শিক্ষকদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলকও করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০'-এর আলোকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও গত এক বছরেও কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এ পরিপত্র মানতে উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যবহারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ২০১০ সালে এক পরিপত্র জারি করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর্থিক কারচুপি ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ২০০৭ সালেও তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি নীতিমালা জারি করেছিল। কিন্তু সেই নীতিমালা আর্থিক বিশৃঙ্খলা রোধে ব্যর্থ হয় এবং খোদ শিক্ষকদের মধ্য থেকেই এই নীতিমালার বিরোধিতা করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় নীতিমালাটি সংশোধন করে নতুনভাবে পরিপত্র জারি করে। এই পরিপত্র অনুযায়ী, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ১৫৪ খাতে অর্থ আদায় করতে পারবে। পরিপত্রে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা কীভাবে ব্যয় করতে হবে এবং আদায়কৃত টাকা থেকে শিক্ষকরা কত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন, সে ব্যাপারেও নির্দেশনা রয়েছে। অথচ বর্তমানে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও পান্না দিয়ে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে চলেছে এবং সেই অর্থ নিয়ে চলে হরিণুট। এসব বিষয়েও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কঠোর নজরদারি নেই।